গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির সুপারিশের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

গত ৮ জুন ২০১১ সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি ৫১ দফা সম্বলিত সংবিধান সংশোধনের সুপারিশ জাতীয় সংসদে পেশ করেছে। উক্ত সুপারিশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পেশকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদাসহ আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং আদিবাসী-বাঙালী নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল জনগণকে 'বাঙালী' জাতি হিসেবে অভিহিত করা ও '৭২-এর সংবিধানে গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধানাবলী সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মোট কথা, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি যে সকল সুপারিশ পেশ করেছে তাতে আদিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যেমন নেই, নেই তেমনি সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বহু মাত্রিকতার প্রতিফলনও। বিশেষ কমিটির সুপারিশে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা '৭২-এর সংবিধানে গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থী। কমিটির সুপারিশে পূর্বসূরী শাসকগোষ্ঠীর মতো উগ্র জাত্যাভিমান ও চরম জাতিগত বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটেছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। নিম্নে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতামত তুলে ধরা হলো–

ক. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী আইনকে বাতিল ঘোষণা এবং সংবিধানকে '৭২-এর সংবিধানের মূলধারায় ফিরিয়ে নেয়ার ঐতিহাসিক ও যুগান্ত কারী রায় দেয়ার ফলে সরকার সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই আলোকে সংবিধানে একক জাতিরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে ধর্ম-জাতি নিরপেক্ষ সংবিধান প্রবর্তনের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০১০ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির নিকট আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনগুলোর আইনী হেফাজতসহ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, আদিবাসী অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী সংশোধনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ এবং আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সম্বলিত ১৪টি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির উক্ত সুপারিশে আদিবাসীদের সেই সকল অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কোন প্রতিফলন নেই। কমিটির ১৫নং সুপারিশে '২৩ক' নামে কেবলমাত্র সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে তথাকথিত সাংবিধানিক স্বীকৃতির লোক দেখানো প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

> "২৩ক। উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।– রাষ্ট্র বিভিন্ন উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

উক্ত সুপারিশে "আদিবাসী" শব্দের পরিবর্তে "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির ক্ষেত্রে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর। আদিবাসীদের "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি লাভের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে খর্ব করে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিচিতি চাপিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি উপনিবেশিক, উগ্র সাম্প্রদায়িক, জাত্যাভিমানী ও আগ্রাসী মানসিকতারই প্রতিফলন বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। এ ধরনের প্রস্তাব আদিবাসীদের নিকট কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিশেষ কমিটির সুপারিশে আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণাসহ সারা দেশের আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ

শাসনব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি সমঅধিকার ও সমমর্যাদার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সংক্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশকরণের মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিনামা পেশ করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদিবাসী জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবরই একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়ে এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। এই বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও ১৯৯৮ সালের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহকে সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু উল্লেখিত কোন প্রস্তাব বিন্দুমাত্র আমলে না নিয়ে বিশেষ কমিটি কেবলমাত্র সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি বিভ্রান্তিকর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে তথাকথিত সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাব করেছে। এমনকি সংবিধানে নতুন একটি তফসিল সংযোজন করে সারা দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের নামের তালিকা সন্নিবেশকরণের যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তাও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

আদিবাসীদের এসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ব্যতীত কেবলমাত্র সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি বিভ্রান্তিকর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে লোক দেখানো, অর্থহীন, অসম্পূর্ণ ও হাস্যকর বৈ কিছু নয় বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। বলাবাহুল্য আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার স্বীকৃতি যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদানের উদাহরণ রয়েছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিশেষ কমিটির ১৫নং সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছে এবং সাথে সাথে "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে নয়, "আদিবাসী" হিসেবে এবং সর্বোপরি আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছে।

খ. আদিবাসীদের 'বাঙালী' হিসেবে আখ্যায়িতকরণ

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের ৬নং প্রস্তাবের মাধ্যমে আদিবাসী-বাঙালী নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে 'বাঙালী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে–

> "৬। নাগরিকত্ব।– (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।
>
> (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিতি হইবেন।"

বলাবাহুল্য বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জাতি ছাড়াও অর্ধ শতাধিক আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিসমূহ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এসব আদিবাসী জাতিসমূহকে বিশেষ কমিটির এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে "বাঙালী" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী, কিন্তু জাতি হিসেবে কোনক্রমেই বাঙালী নয়। তারা জাতি হিসেবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসি, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহাতো, বর্মন ইত্যাদি অর্ধ শতাধিক এক একটি স্বতন্ত্র জাতি।

উল্লেখ্য যে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে "...বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন" মর্মে বিধানের মাধ্যমে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জাতিসমূহকে "বাঙালী" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সে সময় তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালী হিসেবে অভিহিত করার বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি গণপরিষদের অধিবেশন ওয়াকআউট করেন এবং সংবিধান বিলে স্বাক্ষর প্রদানেও বিরত থাকেন।

পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে "...বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" মর্মে সংশোধনের মাধ্যমে সেই ভুল শুধরানো হয়। কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পর আবার এসব আদিবাসী জাতিসমূহকে সংবিধানের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নতুন করে "বাঙালী" হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে উগ্র জাত্যাভিমান, আগ্রাসী মানসিকতা ও চরম জাতিগত বৈষম্যেরই প্রতিফলন বলে প্রতীয়মান হয়। এ থেকে এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যতই দিন বদলের প্রতিশ্রুতি ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করুক না কেন তারা এখনো সেই অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালী জাত্যাভিমানের কুৎসিত খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

তাই জনসংহতি সমিতি বিশেষ কমিটির ৬নং সুপারিশের "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী" অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছে এবং সাথে সাথে এই অংশটুকু বাতিল করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

গ. সংগঠনের স্বাধীনতা

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি মৌলিক অধিকার বিষয়ক তৃতীয় ভাগে "সংগঠনের স্বাধীনতা" সংক্রান্ত ১৭নং সুপারিশে যে সংযোজনী প্রস্তাব করেছে তা সংগঠনের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। উক্ত সুপারিশে (সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ) বলা হয়েছে যে–

"৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা।– জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।"

সংবিধানের "সংগঠনের স্বাধীনতা" সংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদের সাথে উপরোক্ত যে শর্তাংশ সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে তা সংগঠনের স্বাধীনতাকে বা কোন জনগোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতাকে যেমন খর্ব করবে তেমনি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে জাতিগত বৈষম্য ও আগ্রাসনকে বৃদ্ধি করবে।

উল্লেখ্য যে, '৭২-এর সংবিধানে উক্ত সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিধির সাথে এই মর্মে শর্তাংশ ছিল যে, "তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিশেষ কমিটির সুপারিশে উল্লেখিত শর্তাংশ বাতিল করে '৭২-এর সংবিধানে সন্নিবেশিত শর্তাংশ পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছে।

ঘ. বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম ও রাষ্ট্রধর্ম

মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী আইনকে বাতিলের মাধ্যমে একদিকে যেমন ধর্মীয় বৈষম্যমূলক সকল বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে তার মাধ্যমে দেশের সংবিধানকে মৌলবাদী খোলস থেকে বের করে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রূপদানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি ১নং সুপারিশে সংবিধানের প্রারম্ভে ও প্রস্তাবনার উপরে "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম"

সন্নিবেশকরণ এবং ৩নং সুপারিশে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন" মর্মে সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।

উপরোক্ত প্রস্তাবনা বিশেষ কমিটির রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংক্রান্ত ৯নং সুপারিশ (সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ) এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত ১২নং সুপারিশের (সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ) সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধাত্মক। "ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা" সংক্রান্ত ১২নং সুপারিশে বলা হয়েছে যে–

> "১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য– (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন- বিলোপ করা হইবে।"

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিশেষ কমিটির সুপারিশে একদিকে 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান' বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মর্যাদা দেয়ার পরস্পর বিরোধী প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। বস্তুতঃ "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" ও "ধর্ম নিরপেক্ষতা" একসঙ্গে চলতে পারে না। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম" ও "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" রেখে কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না। রাষ্ট্র সবার, ধর্ম যার যার।

এই সংযোজনী প্রস্তাবে যদিও "হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার" কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্যতঃ এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখার রাষ্ট্রীয় ধারাকে আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

> তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিশেষ কমিটির "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম" ও "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" সংক্রান্ত ১নং ও ৩নং সুপারিশ বাতিল করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বর্তমান সরকারের তরফ থেকে জোরেসোরে বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। দেশে ভাষাগত সংখ্যালঘু যারা বাস করে তারা উপজাতি। আইএলও'র সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনভাবেই তাদের আদিবাসী বলা যায় না। কারণ উপনিবেশিক শাসনামলের কারণে তারা কোনভাবেই আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো উচ্ছেদ হয়ে যাননি। বাংলাদেশে সে পরিস্থিতি নেই।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় "আদিবাসী জাতি" বলতে যে অর্থে বুঝানো হয় সেই অর্থে কেবল 'প্রথম বা আদি অধিবাসীদের' বুঝায় না। সেই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তি করে, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে সেই অর্থে আদিবাসী হিসেবে বুঝানো হয়ে থাকে।

শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেমন– ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান, নেপাল প্রভৃতি দেশেও এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে "আদিবাসী জাতি" হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। দেশের শাসকগোষ্ঠী কেবল আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দেখেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা জাত্যাভিমানী ও সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতার কারণে এশিয়ার প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি উল্লেখিত উদাহরণ দেখতে আগ্রহী নন।

আরো উল্লেখ্য যে, আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার মতো আদি বাসিন্দাদের পদানত করে দখল করার কোন বিষয় বাংলাদেশে ঘটেনি বলে যা বলা হচ্ছে তাও সর্বাংশে সঠিক নয়। আইএলও বিধান অনুযায়ী "স্বাধীন দেশসমূহের জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এই বিবেচনায় যে তারা রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের কালে অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের কালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগোলিক ভূখণ্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর বংশধর..."। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন-কাল অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ-কাল থেকে আদিবাসীরা এই ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বা দেশে বসবাস করে আসছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে বিদিত যে, ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবের যখন পরাজয় ঘটে তখন বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য হিসাবে কোচ রাজ্য, অহোম রাজ্য, গারো ও খাসিয়া রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য, চাকমা রাজ্য ও আরাকান রাজ্য ইত্যাদি ছিল। কালক্রমে এ সব রাজ্য ব্রিটিশ ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগকালে ব্রিটিশ ভারতকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টি সুস্পষ্ট ও ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ এ অঞ্চলের প্রথম জনজাতি বা ভূমিপুত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশ বিভাগের সময়কালে চল্লিশ দশকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮.৫% লোক ছিল আদিবাসী জুম্ম বংশোদ্ভূত। বাকি ১.৫% ছিল বাঙালি জনগোষ্ঠী যারা চাকুরী ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সেখানে সাময়িক অবস্থান নিয়েছিল বা তারও আগে আদিবাসী সামন্ত রাজারা লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের জন্য কিছু বাঙালী পরিবারকে বসতি প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামলে অব্যাহতভাবে, বিশেষ করে ১৯৭৯ সাল থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে জুম্ম জনগণের রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় বা প্রথাগত জুম ভূমির উপর বসতি প্রদান করে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল এবং জুম্মদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। নিজভূমিতে তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা তথা জাতিগত নির্মূলীকরণের নীলনকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অপরদিকে ময়মনসিংহের আদিবাসী অধ্যুষিত শেরপুর, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা এই ছয়টি অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে 'আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে চালু ছিল যা আদিবাসী অঞ্চলেরই সাক্ষ্য বহন করে। উত্তরবঙ্গের শ্বাপদ-সঙ্কুল বরেন্দ্র অঞ্চলকে বা মধুপুর গড় অঞ্চলকে কর্ষণযোগ্য ও বাসযোগ্য করেছে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী এই আদিবাসীরা। কিন্তু তাদের জায়গা-জমি, পাহাড়-বন, আবাসস্থল শক্তির জোরে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারা বর্তমানে নিজবাসভূমে পরবাসী একশ্রেণীর অসহায় মানুষে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকে তাদের উপর এই বঞ্চনা ও বৈষম্য আরো জোরদার হয়েছে।

অপরদিকে সরকার আদিবাসী হিসেবে অস্বীকার করলেও দেশে প্রচলিত আইন যেমন– ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৯৫ সালের অর্থ আইন ইত্যাদি আইনে এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্র, ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার ও ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচিতে সুস্পষ্টভাবে "আদিবাসী" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি একটি প্রভাবশালী বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর বা দক্ষিণ সুদানের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বা খ্রীস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে এমনি উদ্ভট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সরকারের তরফ থেকেও এই প্রচারণার সাথে সুর মিলিয়ে আদিবাসী বিষয়ে চরম নেতিবাচক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

বস্তুতঃ আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে বা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী অ-আদিবাসী বা বহিরাগত হয়ে যাবে এমন ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, বর্ণবাদী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈ কিছু নয়। জাতিগত সমস্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনা যতই অধিকার-ভিত্তিক গঠনমূলক সমাধানের পথ গ্রহণ করা হয় ততই সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠে এবং সাথে সাথে ততই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা অধিকতর সুদৃঢ় হয়ে উঠে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে যে, এসব জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হবে। এতে করে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক বহুমাত্রিকতা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হবে।

তাই দেশের নাগরিক হিসেবে মূলস্রোতধারার কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং ধর্মীয় বৈষম্যমূলক সকল বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে–

(১) "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে নয়, "আদিবাসী" হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং নতুন একটি তফসিলে অর্ধ শতাধিক আদিবাসী জাতিসমূহের তালিকা সংবিধানে সন্নিবেশ করা হোক;

(২) কেবল আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের অধিকার নয়, সারা দেশের আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক;

(৩) ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনসমূহ সহ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক;

(৪) সংবিধানে "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী" মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হোক;

(৫) সংবিধানে "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম" ও "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করা হোক;

(৬) সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির ১৭নং সংযোজনী প্রস্তাবের পরিবর্তে '৭২-এর সংবিধানের বিধি প্রতিস্থাপন করা হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে জুন ২০১১ প্রকাশিত ও প্রচারিত।